পাণিনীয় বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা বনাম বিদ্যাসাগরীয়-বর্ণপরিচয়

অসীম সুন্দর মিশ্র *

সংস্কৃত-বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

***Email: asimmishra887@gmail.com**

সারসংক্ষেপ:- *মনুষ্য ভাষার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাব ব্যক্ত করে থাকে। পৃথিবীতে যদি ভাষার মতো কোন বস্তুর অস্তিত্ব ই না থাকতো, বোধ হয় কোন শব্দই হত না। কবি দণ্ডীর কথায় - ''বাণী বিনা সংসারের কার্য অচল হত। আর যদি শব্দ নামক জ্যোতি জগৎ কে প্রকাশিত না করতো তাহলে সম্পূর্ণ জগৎ অবিদ্যারূপী অন্ধকারে ব্যাপ্ত হতো।" তাই ভাষা হল ব্যক্ত বাণী অর্থাৎ যার দ্বারা বর্ণের সুস্পষ্ট উচ্চারণ সম্ভব হয়। আমরা কথা বলার সময় উচ্চারণের প্রতি ধ্যান দিই না। কিন্তু অধ্যয়ন-অধ্যাপনের সময় উচ্চারণের প্রতি ধ্যান দেওয়া উচিৎ। বিশেষ করে পূজো-অর্চনা বা যজ্ঞীয় আচার-অনুষ্ঠানের সুস্পষ্ট রূপে বর্ণের উচ্চারণ করা বাঞ্ছনীয় হয়ে যায়। কারণ উচ্চারণের ত্রুটির ফলে অর্থ অনর্থে পরিণত হয়ে যায় এবং অযাচিত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থেকে যায়। এরূপ ঘটনা যাতে না ঘটিত হয়, তারজন্য আচার্য পাণিনি "বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা" শাস্ত্রে বর্ণের যথাস্থান উচ্চারণ প্রদর্শিত করেছেন। যাতে শিশুরা প্রথম থেকেই সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে সমর্থ হয় এবং পরবর্তীকালে উচ্চারণের দোষে অর্থ অনর্থে পরিণত না হয়ে বিতরীত ফললাভও না হয়।*

অনুরূপভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও "বর্ণপরিচয়" এর মাধ্যমে বাংলায় শিশু-শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। যাতে বাংলার শিশুরা বর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। তাই প. মহাশয় দ্বারা বাংলা "বর্ণমালাকে" নতুন রূপ প্রদান করে বর্ণপরিচয় রচনা করা ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। যার ফল সমাজে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

শব্দসংকেত -

ভাষা, সুস্পষ্ট-উচ্চারণ, যজ্ঞীয়-অনুষ্ঠান, ফললাভ, শিশু-শিক্ষা,দোষমুক্ত ।

ভূমিকা: -

সংস্কৃত-ব্যাকরণ শাস্ত্রের অমর জ্যোতি-স্বরূপ দেদীপ্যমান আচার্য্য পাণিনির সময় বিষয়ে পর্যাপ্ত মত পার্থক্য দেখা গিয়েছে । তবুও প্রামাণিক বিদ্বানদের দ্বারা উনার সময় আনুমানিক 450-400 খ্রী:পূ: মধ্য ভাগ নির্ধারিত করা হয়েছে । আচার্য্য পাণিনির পূর্বজ শালাতুর(বর্তমান-লাহৌর, পাকিস্তান) গ্রামের নিবাসী ছিলেন, তাই তিনি শালাতুরীয় নামে পরিচিত ছিলেন ।

প. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন ঊনবিংশ শতকের এমনই এক ব্যাক্তিত্ব; যিনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতজ্ঞ, সাহিত্যজ্ঞ ও সমাজ-সংস্কারক । কারণ সেসময় দেশে প্রচলিত ছিল নানা কুরীতি ও কুপ্রথা । সেই কুরীতি ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে জোনাকির মতো আলো জ্বালিয়ে সংঘর্ষরত ছিলেন সামান্য কিছু

মানুষ । কিন্তু সেসময় প্রয়োজন ছিল এমন এক ব্যক্তিত্বের, যিনি সূর্যালোকেই সেই প্রচলিত কুরীতি-কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন । তাই সেই প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য সম্ভবামি যুগে-যুগের ন্যায় 26 শে সেপ্টেম্বর 1820 সালে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবীর কোল আলোকিত করে জন্ম নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত অনেক বড় হয়, তাই সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে মূল শীর্ষক নিয়ে আলোচনা করছি ।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য:-

বিদ্যা সদৈব অন্ধকার মুক্ত প্রকাশ প্রদান করে । সেই প্রকাশের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষার । শিক্ষা তখনই সার্থক বলে গণ্য হয়, যখন শিক্ষা বাণি দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয় । এই সুস্পষ্ট ব্যক্ত ধ্বনির মাধ্যমেই বক্তার ব্যক্তিত্ব প্রথম প্রকাশিত হয়ে উঠে । তাই বর্ণধ্বনিকে সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য করার জন্য প্রথম প্রয়োজন পাণিনীয় বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা শাস্ত্রের । কারণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের জন্য প্রয়োজন হয়ই । এছাড়া মানুষ যখন তাঁর জীবনের কল্যাণ সাধনের জন্য মন্ত্র-উচ্চারণ পূর্বক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে, সেই মন্ত্রের উচ্চারণ দোষমুক্ত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ।

অনুরূপভাবে প. বিদ্যাসাগর মহাশয় ও "বর্ণপরিচয়" এর মাধ্যমে বাংলায় শিশু-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন । যাতে বাংলার শিশুরা বর্ণ-শিক্ষা গ্রহণ করে বানান ভূল থেকে মুক্ত থাকে । তবেই এই শিশুরা আগে গিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে, সঙ্গে-সঙ্গে তারা দেশকে কুরীতি-কুপ্রথা মুক্ত করতে পারবে ।

মহান পুরুষদের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন করার পরেও সাম্প্রতিক সমাজের অগ্রগতির জন্য এইসব শাস্ত্রের প্রয়োজন অনুভব করে উক্ত প্রবন্ধে তুলনাত্মক আলোচনা যথাযথরূপে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি ।

গবেষণা পদ্ধতি:-

সুশিক্ষার জন্য বর্ণধ্বনির সুস্পষ্ট উচ্চারণের প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে- "যথা বাণী তথা পাণি" - অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ণকে সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারণ করা । যার প্রভাব ফলপ্রাপ্তির উপর পড়তে থাকে । তাই পাণিনীয় বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা শাস্ত্র অনুসারে উক্ত গবেষণাপত্রে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বনে

বর্ণধ্বনির যথাস্থান উচ্চারণ- প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে । এছাড়া উক্ত গবেষণাপত্রে যথাস্থান উচ্চারণের ফলে লাভ এবং উচ্চারণ দোষের ফল ক্ষতি প্রসঙ্গে ব্যাখ্যামূলক-পদ্ধতিও প্রদর্শিত হয়েছে ।

একদিকে সংস্কৃত বর্ণমালা ও অন্যদিকে প. বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারা বাংলায় শিক্ষা প্রসারের জন্য বাংলা বর্ণমালাকে সাজিয়ে নবরূপে প্রস্তুত প্রসঙ্গ দুটির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ও প্রদর্শিত করা হয়েছে । পাণিনীয় "বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা" ও "বর্ণপরিচয়" থেকে উপাদানগুলি সংগৃহিত হওয়ায় সংগ্রহাত্মক-পদ্ধতি অবলম্বিত ও বলা যেতে পারে ।

সাহিত্য-পর্যালোচনা:-

প্রত্যেক মাতা-পিতা নিজ সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান, যাতে পরে মনুষ্যত্ব লাভ করতে সক্ষম হয় । কারণ যথাযথ বর্ণজ্ঞান না থাকলে শব্দের অর্থ অনর্থে পরিণত হয় । এজন্যই মহর্ষি পাণিনি শব্দশাস্ত্র রচনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ।

প. বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাংলা থেকে কুপ্রথা-কুরীতি দূর করার জন্য শিশু-শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন । তাই তিনি রচনা করেন "বর্ণপরিচয়" । উক্ত গ্রন্থগুলি থেকে বর্ণবিষয়ক তথ্য, উচ্চারণ-পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা আদি বিষয়সমূহ এই গবেষণাপত্রে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি ।

মূল-প্রবন্ধ: -

প্রথমে পাণিনীয় বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা ও বিদ্যাসাগরীয় বর্ণপরিচয় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি ।

বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা - সম্প্রতি উপলব্ধ পাণিনীয়-শিক্ষা গ্রন্থটি 1. শ্লোকাত্মক ও 2.সূত্রাত্মক রূপে বিভৎক ।

1. শ্লোকাত্মক পাণিনীয়-শিক্ষা -

এই গ্রন্থের দুই প্রকার পাঠ উললব্ধ হয়েছে । প্রথম পাঠটি হল লঘুপাঠ । যাকে য়াজুষ পাঠ ও বলা হয় । এই পাঠে 35টি শ্লোক আছে ।

2. সূত্রাত্মক পাণিনীয়-শিক্ষা -

এই গ্রন্থটি আবার লঘু ও বৃহৎ পাঠে বিভক্ত । উই দুই পাঠের মধ্যে সূত্রাত্মক লঘুপাঠটি পাণিনীয় শিক্ষাশাস্ত্র নামে পরিচিত । এই শিক্ষাশাস্ত্রের খোঁজ এবং অনুসন্ধানের কার্য্য স্বামী দয়ানন্দ করেছিলেন । প্রায়:

1936 বিক্রম-সম্বতের মধ্যভাগে প্রয়াগের কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে একটি জীর্ণ, খণ্ডিত, অব্যবস্থিত পাণ্ডুলিপি তিনি প্রাপ্ত করেছিলেন । এরপর তিনি সেই পাণ্ডুলিপিকে মহাভাষ্যাদি গ্রন্থের সাথে সমন্বিত করে আর্য-ভাষাতে অনুবাদ করেন এবং বৈদিক যন্ত্রালয় আজমের থেকে সম্পাদিত করেন । যার নাম ছিল "বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা" । এই পাণ্ডুলিপিটি প্রথমে খণ্ডিত, অব্যবস্থিত থাকায় অনেক ত্রুটি থেকে গিয়েছিল । তাই পরবর্তী কালে পদবাক্য প্রমাণজ্ঞ পণ্ডিত প্রবর বৈয়াকরণাচার্য্য স্বর্গীয় যুধিষ্ঠির মীমাংসক আপিশলি, পাণিনি, চন্দ্রগোমী আদি শিক্ষা-সূত্রগুলির সাহায্যে `শিক্ষা-সূত্রাণি' নামক এক লঘুগ্রন্থ প্রকাশিত করেন । এই শিক্ষা-সূত্রাণি গ্রন্থে পাণিনীয় শিক্ষা-সূত্রের লঘু ও বৃহৎ দুটি পাঠেরই সংগ্রহ আছে ।

বর্ণপরিচয় -

বাংলায় সর্বপ্রথম 1778 সালে ন্যাথনিয়েল ব্রাসিহ্যাল হেডের "A Grammar of the Bengal Language" নামক একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল । এই প্রকাশনাকে বলা হয় বাংলায় মুদ্রণশিল্পের জন্মদাতা। যদ্যপি এই বইটি ছিল ইংরেজী ভাষায়। তথাপি এই বইটির সাহায্যে পরবর্তী সময়ে বাংলা বর্ণপরিচয় ও বাংলা লেখার নিদর্শনগুলি বাংলা লিপিতে ছাপানো সম্ভব হয়েছিল । বাংলার এই মুদ্রণটিতে "বিচল হরফ" নামক একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যে প্রযুক্তির উদ্ভাবক ছিলেন জার্মানির ইয়োহানেস গুটেনবার্গ । তবে, হালেদের এই বইটি প্রকাশিত করার জন্য চার্লস উইলকিন্স এবং তার সহকারী পঞ্চানন কর্মকার সর্বপ্রথম এই "বিচল হরফ" প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন এবং হালেদের এই বইটিতেই সর্বপ্রথম "বর্ণপরিচয়" শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়েছিল । পরবর্তী সময়ে প. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে বাংলায় শিক্ষার প্রসার করেন । তাঁর রচিত "বর্ণপরিচয়" ছিল বর্ণশিক্ষার প্রাথমিক পুস্তিকা । বিহারী লাল সরকারের রচনা থেকে জানা যায় - একবার উনি মফস্বলে স্কুল পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন, যাওয়ার সময় পালকিতে বসেই বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরী করে ফেলেছিলেন ।[1] এই পুস্তিকাটি প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বিভক্ত । 1855 সালের এপ্রিল মাসে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ ও পুনরায় জুন মাসে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল । এই দুটি পুস্তিকার প্রকাশ ছিল তৎকালীন বাংলা শিক্ষা জগতের এক যুগান্তকারী ঘটনা । এই পুস্তিকার মাধ্যমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টা ছিল বাংলা-বর্ণমালাকে সুসংস্কৃত করা । তাঁর কাঙ্ক্ষিত চিন্তন বাস্তবায়িত হয়েছে, তৎসহ বর্তমান সমাজের জনগণের নিকট সমাদৃত সমাদৃত হয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে ।

ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে - একদা প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ও বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থির করেছিলেন - দুজনে একত্রিতভাবে ইংরেজী ও বাংলায় বর্ণশিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকা লিখবেন । উক্ত কথন অনুসারে প্যারীচরণ মহাশয় লিখলেন ``First Book of Reading “ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখলেন ``বর্ণপরিচয়''(প্রথম ভাগ) ।[2] যে পুস্তিকার মাধ্যমে বাংলার শিশুরা বাংলায় বর্ণপরিচয় শিক্ষা অর্জন করতে পারবে । এবং বাংলার মানুষ শিক্ষা অর্জন করার জন্য এগিয়ে আসবে । এভাবে বাংলায় বর্ণপরিচয়ের জন্ম হয় ।

এই ''বর্ণপরিচয়'' পুস্তিকা ধীরে-ধীরে সম্পূর্ণ বাংলাতে বিশেষ স্থান পায় । বাল্যকাল থেকেই সব শিশুকে শিক্ষিত শিক্ষিত করে সমাজের জন্য জাগৃত করা প. মহাশয়ের অভিনব প্রয়াস ছিল ।

বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা -

উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী বর্ণের উচ্চারণ বর্ণের উচ্চারণ করা অবশ্যই প্রয়োজন । তাই উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বর্ণ উচ্চারিত না হলে অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় । বাংলায় বিশেষ করে স, শ, ষ আদি বর্ণগুলির উচ্চারণ স্থান যথাক্রমে - স এর উচ্চারণ স্থান - লৃতুলসানাং দন্তা:,[3] শ এর উচ্চারণ স্থান - ইচুয়শানাং তালু:,[4] ষ এর উচ্চারণ স্থান- ঋটুরষাণাং মূর্ধা ।[5] উক্ত বর্ণগুলি যথাস্থান অনুযায়ী উচ্চারণ না করায় বানান মুখস্থ করতে হয় । বিশেষ করে বঙ্গবাসীর ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দরূপ ও ধাতুরূপ তৈরী করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । কারণ- `রামেষু' স্থানে `রামেসু', ভবিষ্যতি স্থানে `ভবিস্যতি' পঠিত হয়, ফলে ভূল বানান মুখস্থ হয়ে যায় ।

আরো একটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যাক - যেমন ‘জ্ঞান’ শব্দ, এই শব্দে জ্ঞা জ্ +ঞ্ +আন । আমরা বলে থাকি গ্যান । গুজরাটি ভাষায় বলা হয় - গ্নান । এভাবে উচ্চারণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । এজন্য আচার্য্য প্রবর অধ্যায়নের প্রাক বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । বলা হয়েছে - যদি অদিক পড়তে না চাও; তথাপি ব্যাকরণ অবশ্যই পড়া উচিৎ । শ্লোকে বলা হয়েছে -

যদ্যপি বহু নাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণ ।

স্বজন: শ্বজনো মা ভূৎ সকলং শকলং সকৃৎ শকৃৎ বা ।।

অর্থাৎ উচ্চারণের ত্রুটিতে যেন স্বজন >শ্বজন, সকল> শকল, সকৃৎ >শকৃৎ না হয় । কারণ স্বজন শব্দের অর্থ হয় নিজ পরিবার, ও শ্বজনের অর্থ কুকুর হয় । সকল মানে সব, শকল মানে অর্ধেক এবং সকৃৎ মানে একবার, শকৃৎ মানে হয় শৌচ ।

এভাবে উচ্চারণের ত্রুটিতে অর্থ অনর্থে পরিণত হয় ।[6] শাস্ত্রে যজ্ঞীয়-অনুষ্ঠানের ফললাভ করতে হলে; বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ আবশ্যক হয় । নচেৎ উচ্চারণের ত্রুটির ফলে যজমানের উপর প্রভাব পড়ে । যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ মহাভাষ্যে পতঞ্জলি দিয়েছেন - ``তে অসুরা: হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্বন্ত: পরাবভূবু:'' অর্থাৎ অসুরেরা দেবতাদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিল । সেই যজ্ঞে তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে অসুরেরা - `হে অরয়:' উচ্চারণ না করে `হেলয়ো হেলয়:' এরূপ ভূল উচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেছিল । তার ফলস্বরূপ অসুরেরা নিজেরাই পরাজিত হয় ।[7]

এজন্য আচার্য পাণিনি সর্বপ্রথম উচ্চারণ সম্বন্ধিত দোষরহিত পাঠ ও শুদ্ধ বর্ণ উচ্চারণের জন্য প্রস্তুত করেছেন ``বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা'' ।

বর্ণপরিচয় -

প. মহাশয় দ্বারা রচিত বর্ণপরিচয় তৎকালীন বাংলা শিক্ষা জগতের যুগান্তকারী ঘটনা ছিল । বাংলা বর্ণপরিচয়ের পূর্বে বাংলা লিপি সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন । খ্রী.পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মীলিপির উত্তর কুষাণ লিপির জন্ম হয় । এই কুষাণ লিপি থেকে লিপি থেকে গুপ্তলিপির উৎপত্তি হয়েছিল । কালক্রমে সিদ্ধ মাতৃকা-লিপির উৎপত্তি হয় । যার পরিণতি থেকে বর্তমান বাংলা লিপির রূপ নির্মিত হয় । এমন বিবর্তন প্রক্রিয়া প্রায় তিন হাজার বৎসর যাবৎ চলে আসছে । তাই এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বাংলা ভাষারও উন্নয়ন অগ্রসর হচ্ছিল । এমন সময় বঙ্গে পদার্পণ হয় মহান সংস্কৃতজ্ঞ, সমাজ-সংস্কারক প. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের । তিনি এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার ক্রমেই বাংলা বর্ণমালাকে যথাযথ রূপ প্রদান করে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন । তাই বাংলায় শিক্ষা প্রসারের জন্য শিশু-শিক্ষার উপর জোর দিলেন । যেমন পাণিনি জোর দিয়েছিলেন বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষার উপর । উনার প্রতিজ্ঞা ছিল বর্ণ উপদেশ[8] (উপ + দিশ্ + ঘঞ্) করা । কি উপদেশ ? উত্তরে বলা হয়েছে - শাস্ত্রে প্রবৃত্তির জন্য বর্ণগত ক্রমবিশেষের জন্য বর্ণসকলের উপদেশ ।[9] তেমন প. মহাশয়েরও প্রতিজ্ঞা ছিল অব্যবস্থিত বাংলা বর্ণমালার নবরূপে প্রদান করা । যার দ্বারা বাংলার শিশুরা প্রথম থেকেই শিক্ষা অর্জন করতে পারে । তাই তিনি শিশুদের জন্য প্রথম পাঠ উপযোগী সহজবোধ্য

শব্দ রচনা করেন ও পরে সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে পাঠ রচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হলেন । অর্থাৎ বলা যেতে পারে প্রথমে তিনি স্বরজ্ঞান তারপরেই উক্ত বর্ণের মাধ্যমে সচিত্র শব্দজ্ঞান তৈরী করেন । যাতে শিশুরা সহজেই শব্দার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে । যেমন - অ-অজগর, আ - আনারস[10], ইত্যাদি । এরপর উনি এই স্বরবর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে বোঝা যাবে- যে শিশুরা কি কি শিখেছে? অতএব আমরা বোলতে পারি - আজকাল স্কুলগুলিতে, বিশেষ করে প্রাইভেট স্কুলগুলিতে যে সাপ্তাহিক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে, তা বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই দেন । এরপর ব্যঞ্জনবর্ণশিক্ষা ও সচিত্র শব্দ সহিত প্রস্তুত করেছেন । তার সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থা । এভাবে বর্ণপরিচয়ের পর বর্ণযোজনা অর্থাৎ দুটি বর্নযোগে অকারান্ত শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন । যেমন - অজ, এক ইত্যাদি । এরপর উনি আকারান্ত শব্দ, উকারান্ত শব্দ, ওকারান্ত শব্দ, চন্দ্রবিন্দু যোগে ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখিয়েছেন । যাতে শিশুদের ক্রমানুসার বর্ণপরিচয় করানো সম্ভব হয় । এরপর মহাশয় বর্ণযোজনা ও ফলা সংযোগে বানান শেখার পদ্ধতির সূচনা করেন । তারপর দুটি, তিনটি ও চারটি শব্দ যোগে ছোট-ছোট বাক্যরচনা দেখিয়েছেন, যাতে শিশুরা সহজেই বাক্য তৈরী করতে পারে । এটি ছিল বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ, যা 1855 সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়েছিল ।

বর্ণ-সংজ্ঞা -

আচার্য্য পাণিনি অনুসারে বর্ণের সংজ্ঞা হল যা সর্বত্র ব্যাপ্ত ও কখনো নষ্ট হয় না,[11] অথবা যা পূর্ব (অ ই উ ণ্) সূত্র দ্বারা জ্ঞাত হয়, তাকে বলা হয় বর্ণ । আর বাংলাতে বর্ণের সংজ্ঞা বলতে বুঝি- সাধারণত: আমরা কথা বলি ধ্বনির সাহায্যে, এই ধ্বনি লিখে বোঝানোর জন্য কিছু অর্থপূর্ণ চিহ্ন বা সংকেত ব্যাবহার করা হয়, এই চিহ্ন বা সংকেতই হল বর্ণ ।

বর্ণবিভাগ -

বর্ণ দুই প্রকারের হয় - স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ ।

স্বরবর্ণ - - যে বর্ণ অন্যের সাহায্যে নিজে নিজে উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরবর্ণ বলা হয় ।[12] বা যে সকল বর্ণ অন্য আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র উচ্চারিত হতে পারে, তাকে স্বরবর্ণ বলা হয় । যেমন - অচ্ ।[13] বাংলাতে ও স্বর-বর্ণের সংজ্ঞা একই ভাবে স্বীকৃত অর্থাৎ যে বর্ণগুলি আপনা-আপনিই উচ্চারিত হয় অথবা কোন বর্ণের সাহায্য না নিয়ে নিজ থেকে উচ্চারিত হতে পারে, তাকে স্বরবর্ণ বলা হয় । যেমন - অ, আ ইত্যাদি ।

ব্যঞ্জনবর্ণ -

ব্যঞ্জনবর্ণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - যা পরনির্ভরশীল তাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলা হয় ।[14] অথবা ব্যঞ্জযন্তি অর্থান্ প্রকটান্ কুর্বন্তি ইতি ব্যঞ্জনানি ।[15] যেমন - হল্ ।[16] বাংলাতেও বলা হয়েছে - যে সকল বর্ণগুলি স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয় । যেমন - ক, খ ইত্যাদি । এই বর্ণ সদৈব অক্ষত থাকে । এখানে প্রস্ন হল এই বর্ণের উপদেশ কেন করা হয়েছিল? এ বিষয়ে বলা হয়েছে - যাতে মনুষ্য শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মকে জানতে পারে এবং বর্ণের যথার্থ বিজ্ঞানকে জানতে পারে । সেজন্য এই ইষ্ট বুদ্ধি দ্বারা বর্ণের যথাযথ বর্ণের অভীষ্ট স্বরূপক অনায়াসেই প্রাপ্ত করতে পারে ।[17] অর্থাৎ অন্য কথায় শব্দব্রহ্ম দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত করতে পারে ।

বর্ণসংখ্যা -

বর্ণমালার সংখ্যা বিষয়ে পাণিনীয় বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষাতে বলা হয়েছে - ত্রিষষ্টি:[18] অর্থাৎ অকারাদি স্বর ও ককারাদি ব্যঞ্জন বর্ণ মিলে মোট 63টি বর্ণ আছে । যা নিম্নরূপ -

স্বরবর্ণ			ব্যঞ্জনবর্ণ	
হ্রস্ব	দীর্ঘ	প্লুত	ক-বর্গ - ক খ গ ঘ ঙ	অযোগবাহ রূপ বর্ণ
অ	আ	অ^3	চ বর্গ - চ ছ জ ঝ ঞ	বিসর্জনীয়-:
ই	ঈ	ই^3	টবর্গ - ট ঠ ড ঢ ণ	জিহ্বামূলীয়
উ	ঊ	উ^3	ত বর্গ - ত থ দ ধ ন	উপধ্মানীয়
ঋ	ৠ	ঋ^3	প বর্গ - প ফ ব (ৱ) ভ ম	অনুস্বার - ং
ঌ		ঌ^3	অন্তস্থ - য় র ল ব (ৱ)	হ্রস্ব - :
		এ^3	ঊষ্ম - শ ষ স হ	দীর্ঘ - ^
	ঐ	ঐ^3		অনুনাসিক -ঁ
	ও	ও^3		ळ
	ঔ	ও^3		

প. মহাশয় বিরচিত বর্ণপরিচয়ের পূর্বেও ছাপা অক্ষরে এই জাতীয় কিছু পুস্তিকার প্রচলন দেখা গিয়েছিল । যেমন - 1821 সালে রাধাকান্ত দেবের `বাঙ্গলা শিক্ষা গ্রন্থ' রচিত হয়েছিল, 1853 সালে School book of society দ্বারা প্রকাশিত বর্ণমালার প্রথম ভাগ রচিত হয়েছিল, আবার 1954 সালে এই বর্ণমালার দ্বিতীয় ভাগ রচিত হয়েছিল । পরে ক্ষেত্রমোহন দত্ত শিশুদের জন্য বর্ণমালা দিয়েই বর্ণপরিচয় করেছিলেন । পরে প. মহাশয় এই বর্ণমালার যথাযথভাবে ক্রমোন্নতি করতে শুরু করেছিলেন ।[19] সর্বপ্রথম উনিই বর্ণমালা প্রকৃতি ও সংখ্যা নির্ধারণ করেছিলেন । যদ্যপি স্বরবর্ণের সংখ্যা- 16, এই বিষয় নিয়ে হালেদের বইতে প্রকাশিত হয়েছিল । আবার মদনমোহনের শিশু শিক্ষার প্রথম ভাগেও স্বরবর্ণের সংখ্যা 16 ছিল । সেগুলি যথাক্রমে - অ,আ,ই,ঈ,উ.ঊ, ঋ,ৠ, ঌ, দীর্ঘ ঌ , এ, ঐ ও, ঔ , অ0, অ: । প. বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংখ্যা কমিয়ে 12টি স্বরবর্ণ করেন এবং তিনি ভূমিকাতেও লিখলেন ``বহুকাল অবধি বর্ণমালাতে ষোলস্বর ও চৌত্রিশটি ব্যঞ্জন মিলে পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল । কিন্তু বাংলা-ভাষায় দীর্ঘ ৠ-কার ও দীর্ঘ -ঌ কারের প্রয়োজন হয় নাই . এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে । আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হতে পারে না । এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে । আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে এক স্বতন্ত্র-বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে । ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ পদের মধ্যে থাকিলে অথবা অন্তে থাকিলে ড়, ঢ়, য় হয় ।[20]

এই স্বরবর্ণের সংখ্যা বিষয়ে মৌলিক সংস্কারের পর তিনি আর একটি পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন - তাহল, বাংলায় ঌ বর্ণের অপ্রয়োজনীযতার কারণে বাদ দেওয়া । এরপর ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ছিল 34টি, সেখানে প. মহাশয় নতুনভাবে আরো ছয়টি বর্ণ যুক্ত করেন । অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বরবর্ণ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণে যোগ করলেন এবং চন্দ্রবিন্দুকেও তার সঙ্গে যোগ করলেন । এরপর - ড,ঢ,য এর নীচে ফুটকি দিয়ে আরো তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের আবিষ্কার করলেন । এছাড়াও প. মহাশয় দেখলেন - বাংলা-ভাষায় 'ৎ' এর ব্যবহার দেখালেন । যা ত্ কারের রূপ । এই ৎ কে ও ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত করেন ।

মদনমোহনের শিশু-শিক্ষার প্রথম ভাগে যে 34টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে আর একটি বর্ণ যুক্ত ছিল- সেটি হল `ক্ষ' বর্ণ । প. মহাশয় এই বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ক ও ষ এই দুই বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত সংযুক্ত

`ক্ষ' বর্ণটিকে ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে বাদ দিয়লন এবং নিশ্চিত করলেন অসংযুক্ত বর্ণই হবে ব্যঞ্জনবর্ণ । এভাবে বাংলা বর্ণমালাতে মোট 40টি ব্যঞ্জনবর্ণ প্রদশিত হয়েছে । যা নিম্নরূপ -

স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	
অ আ ই ঈ	ক খ গ ঘ ঙ ü	য র ল ব
উ ঊ ঋ ঌ	চ ছ জ ঝ ঞ	শ ষ স হ
এ ঐ ও ঔ	ট ঠ ড ঢ ণ	ড় ঢ় য়
	ত থ দ ধ ন	ৎ ং ঃ ঁ
	প ফ ব ভ ম	

বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা ও বর্ণপরিচয়ের বর্ণের মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য -

বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা	বর্ণপরিচয়
প্লুতবর্ণের ব্যবহার আছে ।	প্লুতবর্ণের ব্যবহার নেই ।
পবর্গ `ব'(ব) এর উচ্চারণস্থান - ওষ্ঠ ।[21] অন্তস্থবর্ণ ব(ব) বর্ণের উচ্চারণস্থান - দন্ত ও ওষ্ঠ ।[22]	পবর্গ `ব'(ব) ও অন্তস্থবর্ণ ব(ব) বর্ণের মধ্যে কোন উচ্চারণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না ।
বর্গীয় `জ' বর্ণ বর্ণ একটিই হয় ।	জ বলতে বর্গীয় `জ' ও অন্তস্থ `য' হয় ।
`ন' ও `ণ' বর্ণ দুটির উচ্চারণ-স্থান যথাক্রমে `দন্ত ও মূর্ধা ।[23]	`ন' ও `ণ' বর্ণ দুটির উচ্চারণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না ।
শ, ষ ,স এর উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন ।	শ, ষ ,স এর উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন হলেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না ।

বিদ্যাসাগরীয় সংস্কার কার্য -

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন । অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কার্য্য করেন । পরে অধ্যাপন কার্য্য ত্যাগ করে একটি ছাপাখানা খুলে সেখানে

বাংলা-বর্ণমালাসংস্কারের কার্য্য প্রারম্ভ করেন । সেই সংস্কারের কার্য্য করতে গিয়ে উনাকে নান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় । সেজন্য তিনি অনেকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কারণ -

1. সংস্কৃতে `য' বর্ণটি বাংলায় `য' লিখা হত , কিন্তু শব্দের অবস্থান ভেদে এর উচ্চারণ `জ' কিংবা `য়' এর মতো উচ্চারিত হত । সেজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় `জ' বর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে `য' বর্ণের ব্যবহার এবং `য' বর্ণের উচ্চারণের জন্য `য' এর নীচে ফুটকি দিয়ে `য়' বর্ণের ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন ।
2. ড ও ঢ বর্ণের নীচে ফুটকি দিয়ে ড় ও ঢ় বর্ণের প্রচলন করেন ।
3. বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রে অব্যবহৃত দীর্ঘ- ঋ ও দীর্ঘ-ঌ বর্ণ দুটির বাদ দিয়েছিলেন । কিন্তু ঌ বর্ণটি অব্যবহৃত হলেও বাদ দেন নি ।
4. ন,ণ, ও শ, ষ, স বর্ণগুলির মধ্যে উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী ত্রুটি থাকলেও এবিষয়ে তিনি কোন সংস্কার দেন নি ।
5. সংস্কৃত বর্ণমালাতে ং , : এবং ঁ ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে আছে । তাই তিনি এই বর্ণগুলিকে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করেন ।
6. এছাড়াও তিনি সর্বপ্রথম ব্যঞ্জনের নীচে (ৃ) (ু) কারাদি চিহ্ন বসিয়ে লেখার প্রচলন করেন ।
7. প. মহাশয়ের পূর্বে ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে ঋ-কারের ব্যবহার বিভিন্ন ভাবে করা হত । কিন্তু প. মহাশয় (ৃ) চিহ্ন দ্বারা লেখার প্রচলন করেন ।
8. যতিচিহ্নের ব্যবহার - প. মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যসাহিত্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার করে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । উদাহরণ হিসেবে বর্ণপরিচয়ের 20তম পাঠে যতিচিহ্ন ব্যবহার দেখতে পাই - গোপাল যেমন সুবোধ; রাখাল তেমন নয় । সে বাপ-মার কথা শুনে না; যা খুশী তাই করে; সারাদিন উৎপাত করে; ছোট ভাই-ভগিনীগুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে । একারণে, তার পিতা-মাতা তাকে দেখিতে পারে না ।[24]

এভাবে তিনি বাংলা বর্ণমালাকে আমাদের সকলের জন্য সাজিয়ে তুলেছিলেন ।

উপসংহার: -

আচার্য্য পাণিনি বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা গ্রন্থ আরম্ভ করার পূর্বে সমাজকে দর্শন করেছিলেন । তাই নিশ্চিত রূপে বলা যেত পারে - সেসময় পাঠদোষে উচ্চারণ ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, যার জন্য তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনাতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । মনুষ্য মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য শাস্ত্র বিধি-বিধান অনুসারে নিষ্ঠার সঙ্গে যজ্ঞীয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন; সেই মনোস্কামনা পূর্ণ হবে না? মনুষ্য হোক, দেবতা হোক অথবা রাক্ষস; সকলেই সেই ফলের অধিকারী হবে । রাক্ষস হলে যজ্ঞের ফল অনর্থে পরিণত হবে, এমন কোন কথা হয় না । তাহলে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান অসিদ্ধ গণ্য হবে । এর মূল কারণ হল বর্ণোচ্চারণে ত্রুটি, যার ফলস্বরূপ অর্থ অনর্থে পরিণত হয় । সেজন্য তিনি অষ্টাধ্যায়ীর প্রারম্ভেই অ ই উ ণ্ অদি মাহেশ্বর সূত্রের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে করেছেন ।[25] যাতে মন্ত্র, সূত্রাদি বিশুদ্ধরূপে পঠিত হয় ।

প. মহাশয়ও বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় পরম্পরাকে অক্ষুণ্ণ রাখার স্বপ্ন দেখেছিলেন । তৎকালীন সামজে প্রচলিত বিধবাদের প্রতি পরিবারবর্গের অসহনীয় অন্যায়-অত্যাচার দেখে গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং শাস্ত্র অনুসারেই তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন । বাল্যবিবাহ রোধের সপক্ষে প্রচারকার্যও করেছিলেন । বহুবিবাহের মতো কুপ্রথা থেকে নারীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করে সমাজকে অবগত করাতে সক্ষম হন যে - ধর্মের নামে প্রচলিত লোকাচার অনুচিৎ কার্য । এজন্য তিনি সর্বপ্রথম বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে শিক্ষার আলো গৃহে-গৃহে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন । তিনি জানতেন - কোন ব্যক্তির বর্ণপরিচয় না থাকলে তার জীবন (লোচনাভ্যাং বিহিনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি) অন্ধব্যক্তির নিকট দর্পণের ন্যায় তার সম্পূর্ণ জ্ঞানই নিরর্থক হবে । তাই তিনি কুরীতিমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই অসম্ভব স্বপ্নকে সাকার করার জন্য ইংরেজ সরকারের মাধ্যমে অইন তৈরী করিয়ে যথাসম্ভব সমাজ-সংস্কারকার্য্য করেছেন ।

পাদটীকা : –

1. বাংলা-সাহিত্যে বিদ্যাসাগর - ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. 85.
2. বর্ণপরিচয়(প্রথম-ভাগ), কলিকাতা, সন্- 1931.
3. অষ্টাধ্যায়ী - 1/1/9
4. ঐ
5. ঐ
6. লঘুসিদ্ধান্ত- কৌমুদী, পৃ. 10
7. মহাভাষ্য(পস্পশাহ্নিক)

8 . অষ্টা. 1/3/2
9 . উচ্চারণম্ । কুত এতত্ ? দিশিরুচ্চারণমক্রিয়: । বৃত্তিসমবায়ার্থো বর্ণানামুপদেশ: । (উচ্চারর্য হি বর্ণানাহ-``উপদিষ্টা ইমে বর্ণা'' ইতি) মহা.ভা.-বা.16
10 . বর্ণপরিচয় -ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ।
11 . মহা. ভা. - 1/1/5
12 . ঐ - 1/2/1
13 . ঐ
14 . ঐ
15 . ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য - উবটভাষ্যম্
16 . সমগ্র ব্যা. কৌ. - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃ. 2
17 . ম. ভা - 1/1/2
18 . বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা, পৃ. 5
19 . বর্ণপরিচয় রচনা ও প্রকাশনার ইতিহাস ।
20 . বর্ণ. র. প্র. ইতিহাস ।
21 . স. ব্যা. কৌ, পৃ.- 5
22 . স. ব্যা. কৌ, পৃ.- 7
23. স. ব্যা. কৌ, পৃ.- 5
24 . বর্ণপরিচয় (প্রথম-ভাগ) ।
25 . অ ই উ ণ্ - সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ ।

সন্দর্ভ-গ্রন্থসূচী:-

1. শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত ব্যাখ্যা সহিত, 2009, বর্ণোচ্চারণ-শিক্ষা(পাণিনি-মুনি-প্রণিতা), রামলাল কপূর ট্রাস্ট, সোনীপত ।
2. শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সং-1931,বর্ণপরিচয়(প্রথম-ভাগ), কলিকাতা ।
3. ড. দ্বিবেদী কপিলদেব,1983, লঘুসিদ্ধান্ত কৌমুদী, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, বারাণসী ।
4. ড. কর গঙ্গাধর ন্যায়াচার্য্য, 2002 মহাভাষ্যম্ সংস্কৃত বুক ডিপো, 28/1 বিধান সরণী, কোলকাতা ।
5. দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থ , jun-2009, , সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর), শ্রীঅরুণ কুমার মজুমদার,দেব সাহিত্য কুটীর প্রা.লি.21, কলিকাতা ।
6. প্রো. পাণ্ডেয় গোপালদত্ত , 1992, অষ্টাধ্যায়ী, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী ।
7. ড. ত্রিপাঠী রমাকান্ত, 2008,রঘুবংশম্ , চৌখম্বা প্রকাশন, বারাণসী ।
8. ড. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত, 2005, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা ।